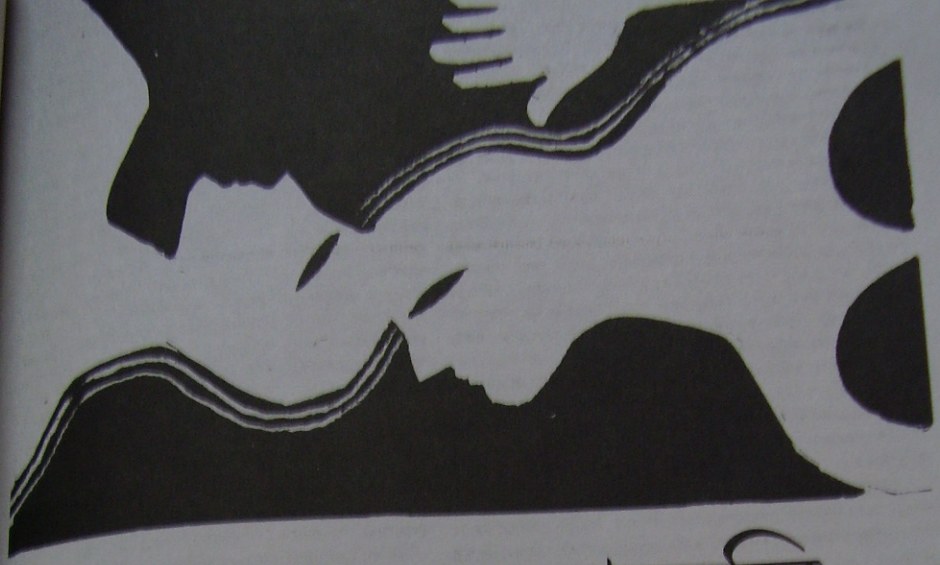

মনোভূমি

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

যশোর রোড ধরে ছুটছিল গাড়ি। তেমন একটা জোরেও না, আবার ঢিকঢিক করেও নয়, মাঝারি গতিতে। রবিনের মধ্যবয়সী অবাঙালি ড্রাইভারটি রবিনেরই ছাঁচে গড়া, কখনওই স্পিড তোলে না বড় একটা। এই মধ্যনিশীথে রাস্তায় যান চলাচল অনেক কম, তবু সে রীতিমাফিক সাবধানী।

আমরাও অবশ্য চাইছিলাম না গাড়ি জোরে চলুক। রবিনের কথা বাদ, সে তো এমনিতেই ধীরে চলো, সামলে সুমলে চলো পন্থী। জীবনের সর্ব ক্ষেত্রেই। আমি আর সৌরভ তাও ক্বচিৎ কখনও গতির প্রলোভনে পড়ি। কিন্তু এই মুহূর্তে পরিস্থিতি অন্যরকম। আজই সন্ধেবেলা এক মর্মান্তিক কাণ্ড ঘটে গেছে। সম্ভবত ওই গতির কারণেই। হাইওয়ের ওপর একটি ট্রাকের সঙ্গে নাকি মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে তথাগতর মারুতির। কৃষ্ণনগরের কাছাকাছি। গাড়িতে ভাস্বতীও ছিল, দুজনেই স্পট ডেড। এমন একটা দুঃসংবাদ পেয়ে যারা কলকাতা থেকে দৌড়ে যাচ্ছে, তারা গাড়ি জোরে ছোটাবেই বা কোন সাহসে!

নভেম্বরের রাত। বাতাসের চোরা সিরসিরে ভাব ঝাপটা মারছে চোখেমুখে, তবু কাচ তুলতে ইচ্ছে করছিল না। মনে হচ্ছিল ওই হাওয়াটুকু না পেলে বুঝি দম বন্ধ হয়ে যাবে। চোখ আলগা মেলা আছে বাইরে, অথচ কিছুই প্রায় দেখছি না। ডান দিকে বিমানবন্দরের রানওয়ে, এত রাতেও বিকট শব্দ করে একটা প্লেন উড়ল, কেউ যেন লক্ষ করলাম না সেভাবে। যেন উড়োজাহাজের ওরকম ওঠানামা আমাদের চোখসওয়া। একখানা ফাঁকা লরি ভীমবেগে আমাদের অতিক্রম করে গেল, আমাদের ঘাড় একটুও ঘুরল না। দু দুটো টাটকা প্রাণের চকিত মৃত্যু আমাদের স্নায়ুকে যেন অবশ করে রেখেছে। অন্তত আমাকে তো বটেই। ভাবতেই পারছি না, যে তথাগতর সঙ্গে পরশুও অত আড্ডা হল, সে আর বেঁচে নেই! ভাস্বতীর সঙ্গে ইদানীং কমই দেখা হত, তবু সেও তো না হোক আমাদের বিশ বছরের বন্ধু! একটা মাত্র মুহূর্তের টোকায় দুজনেরই চিরবিদায়, জীবন কি এতই অনিত্য? মৃত্যু কি এমনই নিষ্ঠুর?

সৌরভ বসেছে ড্রাইভারের পাশে। পিছনে আমি আর রবিন। টের পাচ্ছি আমরা তিনজনই কথা বলতে চাইছি কিন্তু কথা খুঁজে পাচ্ছি না। নীরবতা একটা চাপা গুমোট তৈরি করছে গাড়ির ভেতর। আমাদের ভেতরেও। অস্বস্তি কাটাতেই মোবাইলটা বার করলাম পকেট থেকে, নাড়াচাড়া করছি অকারণে।

আচমকা রবিন বিড়বিড় করে উঠল, কোনও মানে হয় না।

এই সূচনাটুকুরই বুঝি প্রয়োজন ছিল। সৌরভ সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বসেছে, —কীসের রে?

—কোনও কিছুরই কিছু মানে হয় না। হঠাৎই ট্রিপের মধ্যিখানে উদ্ভট শখ ... প্রমোদভ্রমণে চলল দুজনে ... দুম করে জোড়া মৃত্যু ...

This Book Downloaded From
http://Doridro.com

—কোথায় যাচ্ছিল বল্ তো?

—হবে বেথুয়াডহরি ফহরি। মাঝেমাঝেই তো ভাস্বতীকে নিয়ে দুমদাম এদিক ওদিক চলে যেত। থোড়াই জানিয়ে যেত কোথায় যাচ্ছে!

—কিন্তু পুলিশ তোর নাম্বারটা পেল কোথ্থেকে?

—তথাগতর ডায়েরি। প্রথমে নাকি তথাগতর ফ্ল্যাটেই ফোন লাগিয়েছিল। সেখানে রিসিভার ওঠাবে কে, ফ্ল্যাট তো ফাঁকা, অবিরাম রিং হয়ে গেছে। তারপর পাতা উল্টোতেই নাকি প্রথমে আমার নাম্বারটাই ...। রবিন সিটে হেলান দিল —কপাল দ্যাখ, সবে তখন বুল্টুকে হোমটাস্ক করিয়ে খেতে বসার জন্য উঠছি, তখনই ...। তোদেরও তো খাওয়া আজ চৌপাট?

—হুম্। আমি তখন জাস্ট সেকেন্ড গরাসটা মুখে তুলেছি।

—কোনও মানে হয়? কোনও মানে হয়? এই যে আমরা খবরটা পেয়েই হাঁইহাঁই করে ছুটছি, এরও তো কোনও মানে হয় না! গিয়ে কখন বডি পাব তার ঠিক আছে? স্রেফ তীর্থের কাকের মতো বসে থাকা ...

—তা তো বটেই। সিগারেটের প্যাকেট বার করে একটা বাড়িয়ে দিলাম সৌরভকে। অনেকক্ষণ পর কথায় ফিরতে পেরে যেন নিজেকে হালকা লাগল একটু। ঠোঁটে সিগারেট চেপে বললাম, পোস্টমর্টেম হতে হতে অন্তত কাল দুপুর। তারপর তো বডি হ্যান্ডওভার করার প্রশ্ন। অবশ্য আদৌ যদি বন্ধুদের হাতে বডি ছাড়ে!

সৌরভ হাওয়া বাঁচিয়ে সিগারেট ধরিয়েছে। ধোঁয়া ছেড়ে বলল, —সে পটিয়েপাটিয়ে ম্যানেজ করা যাবে। বলব, তথাগতর তিন কুলে কেউ নেই। ... ইনফ্যাক্ট, নেইও তো। ডিভোর্সি মানুষ, বাচ্চার দায়িত্বও নিতে হয়নি, বাপ-মা দুজনেই পরপারে, দিদি আমেরিকায়, কস্মিনকালে কোনও আত্মীয়স্বজন ওর খোঁজ নেয় বলে শুনিনি ... তাহলে আমরা ছাড়া ওর আছেটা কে!

—দ্যাখ, পুলিশ যদি তোর যুক্তি মানে।

—মানবে, মানবে। লাশ আটকে রাখা মানে তো পুলিশেরই হ্যাপা। আইডেন্টিটি কার্ড সঙ্গে আছে, চাইলে দু-চার লাইন লিখেও দেব ...

—অ্যান্ড হোয়াট অ্যাবাউট ভাস্বতী?

—সে তো আমাদের ভাবার কথা নয়। শি ইজ আ ম্যারেড উওম্যান, তার বর ভাববে। সৌরভ আর একটু ঘুরে রবিনকে জিজ্ঞেস করল, —আশিসবাবুকেও তো তুই জানিয়ে দিয়েছিস, তাই না?

—অবশ্যই। সঙ্গে সঙ্গে ফোন করেছিলাম।

—শুনে কী রিঅ্যাকশান?

—প্রথমে তো বিশ্বাসই করে না। বলে ভাস্বতী তো বোনের বাড়ি গেছে! বজবজ! কী করে কৃষ্ণনগরে ...! তথাগতর নামটা শোনার পর কানে জল ঢুকল। দু-চার সেকেন্ড চুপ। অ্যান্ড দেন হাউমাউ কান্না।

—এহে, ব্যাপারটা খারাপ হল। আমি মাথা নাড়লাম—তথাগতর কথাটা কেন বলতে গেলি?

—স্ট্রেঞ্জ! এ ছাড়া আর কী বলতে পারতাম? আপনার বউ একা একা গাড়ি চড়ে কৃষ্ণনগরে হাওয়া খেতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্টে মরেছে? সেটা কি খুব বিশ্বাস্য হত?

—তা হয়তো নয়। তবু ...

—হয়তো তবুর এখানে কোনও জায়গা নেই জয়। ভাস্বতী যখন তথাগতর সঙ্গে ছিল, তখন নিউজটাকে কোনও ভাবেই সাপ্রেস করা যাবে না। শুধু তাই নয়, জানার পরে আশিসবাবু কী ভাবলেন, না ভাবলেন, কতটা শক্ড হলেন, এইসব প্রসঙ্গও এখন অবান্তর।

সৌরভও একমত। নীরস গলায় বলল — সত্যিটা তো ভদ্রলোককে বলতেই হবে। এবং ভদ্রলোককেও সত্যিটা শুনতেই হবে। এর কোনও মাঝামাঝি নেই। মৃত্যুর পরে ঢাকঢাক গুড়গুড়ের মিডল্‌ক্লাস হিপোক্রেসি আর চলে না।

যুক্তির দিক দিয়ে ভাবলে সৌরভ ভুল বলছে না। কিন্তু আমার কেন যেন ভাল লাগছিল না। ভাস্বতীর অবৈধ প্রণয়ের ব্যাপারটা আশিসবাবু জানতেন কি? আঁচ নিশ্চয়ই করতেন। একই ছাদের নীচে যখন বসবাস, বউয়ের চালচলন হাবভাব দেখে কিছুই কি আন্দাজ করা যায় না? তাছাড়া ঘটনা তো এক দিনেরও নয়, আকস্মিকও নয়, বেশ কয়েক বছর ধরে চলছে। নেহাত নিরেট কিংবা অন্ধ না হলে খানিকটা তো বুঝতেই হয়। হয়তো পুরোপুরি অবহিত ছিলেন না, অন্তত তথাগতর কথা শুনে তো তাই মনে হত। সংসারে অনেক অপ্রিয় সত্যকেই তো আমরা টের পাই, তবে যতক্ষণ তা আড়ালে আবডালে থাকে আমরা হজমও করে নিই। পরদা হঠাৎ সরে গেলে সত্যের অনাবৃত চেহারাটা কি অসহনীয় ঠেকে না? এই যে আমার আর শর্মিষ্ঠার এগারো বছর বিয়ে হয়েছে, এখনও বাচ্চাকাচ্চা হল না, অক্ষমতাটা কার তা জানার জন্য ডাক্তারের কাছে আমরা গেছি কোনও দিন? কেন যাচ্ছি না? সত্যিটা ধরা পড়ার ভয়েই তো। বরং সংশয়টা থাকুক, সংশয়েই স্বস্তি, সংশয় নিয়েই বাঁচি। হয়তো এটা উটপাখির স্বভাব, কিন্তু আমরা কেউই তো এর ব্যতিক্রম নই! আশিসবাবুও নয়। কাল কাগজে নাম টাম বেরিয়ে গেলে কী করে পরিচিত মহলে মুখ দেখাবেন ভদ্রলোক? মধ্যবয়সে পৌঁছে এই অসম্মানটা কি আশিসবাবুর প্রাপ্য ছিল? একটাই বাঁচোয়া, ভাস্বতীরাও নিঃসন্তান। পেটেই তিন-তিনবার বাচ্চা নষ্ট হয়ে গেছে ভাস্বতীর। ছেলেমেয়ে থাকলে তারাও তো আজ চরম লজ্জায় পড়ত।

গাড়ি মধ্যমগ্রাম পেরোল। যশোর রোড ছেড়ে ঘুরেছে বাঁয়ে। দু-ধারের [illegible] জনপদ আশ্চর্য রকমের নিঝুম এখন। শুনশান রাস্তায় পথবাতিরা দুর্বল প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে। খানিক এগোতেই লেবেল ক্রসিং। গেট খোলা। দুলে দুলে রেললাইন টপকাল অ্যাম্বাসাডার, হোঁচট খেতে খেতে। আচমকা একপাল নেড়ি কুকুর সমস্বরে ডেকে উঠেছে। রাত্রির নৈঃশব্দ্য ভেঙে খান খান।

রবিন বিরক্ত চোখে ঝলক দেখল কুকুরগুলোকে। তারপর মুখ ফিরিয়ে গোমড়া গলায় বলল, —আমার তো মনে হয় এখন আমাদের অন্য সমস্যাটার কথা ভাবা উচিত।

—কী?

—আশিসবাবু যদি আদৌ বডি নিতে না আসেন?

—যাহ্, তা কেন হবে? তুইই তো বললি ভদ্রলোক খুব কাঁদছিলেন?

—সে তো ছিল তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। একটু থিতু হওয়ার পর নিশ্চয়ই অতটা শোক আর থাকবে না। তখন যদি অন্যভাবে রিঅ্যাক্ট করেন? আফটার অল স্ক্যান্ডালটা নিশ্চয়ই ওঁর মর্যাদা বাড়াবে না? তাছাড়া রাগ অভিমান বলেও তো ডিক্সনারিতে দুটো শব্দ আছে, না কী?

—তাহলে তো সাড়ে সর্বনাশ রে। ভাস্বতীর বডির কী গতি হবে?

—আহা, আগেই নেগেটিভটা ধরে নিচ্ছিস কেন? চুপ থাকতে না পেরে বলে উঠলাম — আশিসবাবু জেনুইন জেন্টলম্যান। মনে যে বিক্রিয়াই হোক, স্ত্রীর দেহ সংকার করতে উনি আসবেনই।

—ধর এলেন না... তখন?

—তাহলে ভাস্বতীর বাপের বাড়ি থেকে কেউ আসবে। দাদা বা ভাই...। আর না এলেই বা কী, আমরা তো আছি। একটু দম নিয়ে বললাম, ভাস্বতী তো আমাদেরও বন্ধু। হয়তো তথাগতর মতো অত ঘনিষ্ঠ নয়। কিন্তু কলেজ লাইফ থেকে ওকে আমরা চিনি... ভাস্বতীর বিয়েতে সকলে গেছি, অবরে সবরে এখনও আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হয়... ভাস্বতীর সৎকারের দায়িত্বটুকু আমরা নিতে পারব না!

—জ্ঞান মারিস না। তেমন অড সিচুয়েশান হলে আমাদেরই যে সব করতে হবে, এ বোধ আমারও আছে। কিন্তু...

—কী কিন্তু? কীসের কিন্তু?

—আমি শুধু তথাগতর আক্কেলটার কথা ভাবছি। রবিনের স্বর সহসা চড়ে গেল, হি ওয়াজ সো ইরেসপন্সিবল, সো ইরেসপন্সিবল...!

রবিনের হাতে মৃদু চাপ দিলাম, থাক না রবিন। এখন আর ওসব কথা তুলে কোনও লাভ আছে!

লাভ-লোকশান বুঝি না। চিরটাকাল ও শালা নিজের ইচ্ছেমতো লাইফ লিড করে

This Book Downloaded From
http://Doridro.com

গেল...এমন যে, তারও কোনও ভিত্তিই নেই... আজও চুপ করে থাকব?

—আমরা কি সর্বদাই চুপ থেকেছি রবিন? ভাবে দেখোইনি। বারবার বলিনি, এবার লাইফ পার্টনারটিকে চেঞ্জ কর?

—সেই জন্যই তো আরও বেশি করে লাগছে। তথাগতর স্বভাবচরিত্র বদল আমরা ঘটাতে পারিনি। হারামজাদাটা কোনও নিয়মের মধ্যে এলই না। রবিন ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলল—সেই কলেজ লাইফ থেকেই তো দেখছি। তখনও যা, এখনও তাই। রিপুর দাস। রিপুর ওপর একটুকু কন্ট্রোল নেই। তোদের নিশ্চয়ই মনে আছে, ভাস্বতীর সঙ্গে কী প্রচণ্ড লটঘটটাই না চালিয়েছিল কলেজে? সারাক্ষণ ভাস্বতীর গায়ে সেঁটে আছে, যেন স্টিকিং প্লাস্টার। করিডোর, লাইব্রেরি, সিনেমা হল, কফি হাউস, গঙ্গার পাড়, ভিক্টোরিয়া...। তোদের চেয়েও তথাগতর সঙ্গে তখন আমার ইন্টিমেসি বেশি। আমাকে তো ডেলি ডিটেল শোনাত। কবে চুমু খেল, কিংবা আর কী কী করল...। সেই মক্কেল গ্র্যাজুয়েশনের পর ভাস্বতীকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিল্লি হাওয়া। এম-এ করে ফিরল বটে কলকাতায়, কিন্তু তখন আর ভাস্বতীকে যেন চিনতেই পারে না। পরে শুনলাম জে-এন-ইউতে কোন পুনমের সঙ্গে এমন আশনাই চালিয়ে এসেছে, তার তুলনায় ভাস্বতীকে এখন পাত্তাই দেয় না। তারপর তো চাকরি পেয়ে জয়িতার সঙ্গে ভাব হতেই পুনমও মন থেকে ভ্যানিশ। তা জয়িতার সঙ্গেও কি টিকতে পারল? বিয়ে করল, এক বছরের মাথায় ভোকেশন, ব্যস প্রেম খতম। আমরা গোড়াতেই জানি জয়িতা মোটেই খারাপ গৃহিণী ছিল না। গোছানো, সংসারী, রুচিবোধ আছে। আর বউ, যথেষ্ট ভাল। শুধু বাপের বাড়ির দিকে একটু টান বেশি ছিল, এই যা। তো সেটা কি খুব দোষের? বাপ-মা-র একমাত্র সন্তানকে তো অনেক সময়ে মেয়ে হয়েও ছেলের কর্তব্য পালন করতে হয়। ঠিক কি না তোরাই বল? তা সেই জয়িতার ওপর কী অত্যাচার না চালিয়েছিল তথাগত। অ্যাবসোলিউটলি রেকলেস লাইফ লিড করছে, রোজ রাতে মদে চুর হয়ে ফেরে, বাড়ি ঢুকে হল্লাগুল্লা...। তোরা হয়তো জানিস না, রেগুলার একটা জুয়ার ঠেকেও যেত সেই সময়ে। নিজের পকেট মদে দিয়েই ফক্কা, জয়িতার মাইনে নিয়ে টানাটানি করছে! জয়িতার মতো মেয়ে কদ্দিন এরকম হাজব্যান্ডকে বরদাস্ত করবে! তিনটে বছর যেতে না যেতেই সম্পর্ক ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই, ছেলে নিয়ে পালিয়ে বাঁচল জয়িতা। তাতেও কি শালার চৈতন্য হল? জয়িতার সম্পর্কে তোর যদি কোনও অভিযোগ থাকেও, তা নিয়ে আর গাওনা গেয়ে তো লাভ নেই! রিলেশন ভেঙে

গেছে, সেকেন্ডে আবার
নিজেকে স্বপ্নে নিয়ে এসে
কোথায় কী। আবার পুনম
উঠল, খাটা নিয়ে
সংসারে। বর নিয়ে ভাস্বতী
করছিল, সেই মেয়ে পুর
মেয়েটাকে। লাইফের খাপখাওয়াই
ভাস্বতীর। এরই যদি কোনও
ভাস্বতীকে ডিভোর্স করিয়ে ছাড়
একতালে মেয়েটা তোকে ভালবাস
খালি অফচান্স নিয়ে খালি? রবি
ক্ষণকাল। আবার একটা নিশ্বাস ফেল

—আলটিমেটলি ভাস্বতীকে মেরে
তথাগতর হাড় জুড়োল।

বিনা প্রতিবাদেই শুনছিলাম
সবটাই যে মানতে পারছিলাম, তা ন
হচ্ছিল রবিনের দৃষ্টিটা যেন একটু
তথাগতকে প্রায় খলনায়ক বানিয়ে
রবিন। মেপেজুখে হয়তো চলত না
তবে অতটা কি বাড়ে ছিল? জয়িতার সঙ্গ
তথাগতর মিলমিশ হয়নি, তা কি অত
দুয়ে দুয়ে চার করে বলে দেওয়া
স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যে কেমন ভাবে, তৃতীয়
কখনও কি তা পুরোপুরি বুঝে উঠতে পা
ইয়ারদোস্তদের কাছে এসে যে যতই
কথা বলুক, কোথাও একটা কিছু কি

মহল ল্যাম্প শেডস

২২৭/২ আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড, কলকাতা- ২০, ফোন : ২২৪৭ ২৭১০/৭০৮৫, ফ্যাক্স

গাড়ি রাখার ব্যবস্থা আছে

e-mail

থেকে যায় না? যা শুধু চারটে দেওয়ালই জানতে পারে, আর কেউ না। কিংবা দেওয়ালেরও অজ্ঞাত থাকে। হৃদয়ের অন্দরমহলের ছবি দেওয়ালও কি দেখতে পায়? ভাস্বতীর কাছে কেন ফের গেল তথাগত, কীভাবেই বা তাদের টালমাটাল সম্পর্ক গত পাঁচ-ছ বছর ধরে গড়াল, তাও কি রবিনের পক্ষে নির্ভুলভাবে বোঝা সম্ভব? ঘর থাকা সত্ত্বেও ভাস্বতীই বা কেন প্রশ্রয় দিত তথাগতকে?

সৌরভ সিধে হয়ে বসেছে। উইন্ডস্ক্রিনে চোখ রেখে হঠাৎই বলে উঠল, —একা তথাগতকেই তুই দোষী ঠাউরে ফেললি রবিন?

—বিচার করার আমি কে। যা ফ্যাক্ট, তাই বললাম।

—আমার তো মনে হচ্ছে তুই ঝাল মেটাচ্ছিস।

—কিসের ঝাল?

—তোদের মতে মিলত না বলে। তুই ওকে লক্কা পায়রা বললেও, ও তোকে গৃহপালিত জন্তু বলত, তাই।

—যাহ্ বাবা, শেষে এই মানে করলি! তথাগতর ওপর কি আমি এখনও রেগে থাকতে পারি? তথাগত কি আমার বন্ধু নয়? রাতদুপুরে ছুটছি তবে কীসের টানে? গাড়ি সামান্য গতি বাড়িয়েছে। হেডলাইটের দ্যুতির ওপারে পথের কিছুই দৃশ্যমান নয়। দু পাশে ছমছম করছে অন্ধকার। মাঠেঘাটে। গাছগাছালিতে। হঠাৎ হঠাৎ ধেয়ে আসা ছোট-বড় লোকালয়েও। আকাশে চাঁদ উঠেছে এক ফালি। তবে হেমন্তের কুয়াশা পেরিয়ে তার কিরণ ঠিকঠাক পৌঁছচ্ছে না ধরণীতে। আধো আলো আধো আঁধার জড়ানো কুয়াশার দিকে তাকিয়ে রবিন আপন মনে বলল—তথাগত তথাগতর মতো। আমি আমার মতো। আমি মন দিয়ে ঘরসংসার করি, বউছেলেকে ভালবাসি, উল্টোপাল্টা পয়সা ওড়াই না, কোনও রকম নেশায় আসক্ত নই... আমার একটা ডিসিপ্লিন আছে। এবং আমি এই লাইফটাই পছন্দ করি। তথাগত ঠাট্টা করে কী বলল, তা আমি গায়ে মাখব কেন। তা বলে তথাগতর জীবনযাপনের ধারাটা যে আমার না-পসন্দ, এ আমি উচ্চারণ করতে পারব না? এ তো অস্বীকার করার উপায় নেই, তথাগতর পাল্লায় পড়েই ভাস্বতীকে বেঘোরে প্রাণ হারাতে হল।

—আই ডিফার। সৌরভ জোরে জোরে মাথা নাড়ল, আই স্ট্রংলি ডিফার।

—ভাস্বতীর প্রাণ বেঘোরে গেল না? এতে তথাগতর কোনও দায় নেই?

—উঁহু। উল্টোটাই সত্যি। ভাস্বতীর পাল্লায় পড়েই মোলো তথাগত...। সৌরভ ফের ঘুরে বসেছে। হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিল আমার কাছ থেকে। ধরিয়ে বলল, তথাগতর জীবনকাহিনী তুই যতটা জানিস বটে, কিন্তু নিজের ইচ্ছে মতন করে সাজিয়ে। আমার ধারণা, ভাস্বতী চিরকালই তথাগতকে ইউটিলাইজ করেছে। স্টুডেন্ট হিসেবে তথাগত দারুণ ব্রিলিয়ান্ট ছিল, দেখতেও হ্যান্ডসাম, তাই ভাস্বতীই গায়ে পড়ে এসে ওর সঙ্গে ভাব জমিয়েছিল। এবং কলেজ লাইফের প্রেমটা ছিল ভাস্বতীর নাথিং বাট অভিনয়। ভাস্বতী ডিচ করেছিল বলেই হাফসোল খেয়ে তথাগতর দিল্লি প্রস্থান। সেখানে পুনমের সঙ্গে মিশে ভাস্বতীকে ভুলতে চাইল। পারল না। ভাস্বতীর ম্যাগনেটিক চার্মে আবার ফিরল কলকাতায় কিন্তু ভাস্বতী ওকে আর ধরেকাছে ঘেঁষতেই দিল না। সে তখন আশিস সিনহার প্রেমে মাতোয়ারা। নামী কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার, সেটলড ফিউচার, তথাগতকে আবার আমল দিতে তার বয়েই গেছে। বেচারা তথাগত জয়িতাকে আঁকড়ে ধরে লাইফটাকে স্টেডি করার চেষ্টা করল। এদিকে হৃদয়ে তার রয়ে গেল ভাস্বতী। পরিণাম যা হয়! জয়িতাকে অসহ্য লাগতে শুরু করল, উদভ্রান্তের মতো মদ ধরল, জড়িয়ে গেল আরও নানান নেশায়। জয়িতা কখনওই তথাগতকে ফিল করার চেষ্টা করেনি। তথাগত কেন যে অমন আচরণ করছে, সেটা তলিয়ে ভাবারও প্রয়োজন মনে করেনি কোনও দিন। বরং আরও বেশি আঘাত দিয়ে, তথাগতর পায়ে ডান্ডা মেরে, ড্যাং ড্যাং করে বাচ্চা নিয়ে কেটে পড়ল। অ্যাট দ্যাট হাফ-দিওয়ানা স্টেট অফ তথাগত, ভাস্বতীর সঙ্গে তার পুনরায় সাক্ষাৎ। ভাস্বতীর তদ্দিনে আশিসবাবুর সঙ্গে বেশ কয়েক বছর ঘর করা হয়ে গেছে, আশিস তখন তার কাছে ঘর কা মুরগি ডাল বরাবর। আশিসবাবুকে তোরা দেখেছিস, নিপাট ভালমানুষ। ওই ধরনের পুরুষে মহারানির আর মন ভরছে না। সম্ভবত যৌনক্ষুধার অতৃপ্তি থেকেই...। সৌরভ গলা নামিয়ে ড্রাইভারকে একবার দেখে নিল, হ্যাঁ, আউট অফ শিয়ার সেক্সচুয়াল আর্জ ফের পাকড়াও করল তথাগতকে। দায়হীন সম্পর্ক। শুধুই মৌজমস্তি। গ্লাস লুকিয়ে চুরিয়ে আশনাই চালানোর এক নিষিদ্ধ পুলক... আজ দিঘা যাচ্ছে, কাল ডায়মন্ডহারবার তো পরশু কাঁকড়াঝোড়। দু হাতে দুইয়েও নিচ্ছে তথাগতকে। পুরো ফাঁদে পড়ে গিয়েছিল বেচারা। নেশাগ্রস্তের মতো আটকে পড়েছিল ভাস্বতীর জালে। সত্যি সত্যি যদি তথাগতর ওপর কণামাত্র টান থাকত, তবে কবেই তো সে আশিসবাবুকে লাথি মেরে তথাগতর কাছেই চলে আসত। আমার ধারণা, তথাগত ইদানীং ভাস্বতীর খেলাটা বুঝতে পারছিল। এমনও তো হতে পারে, এসব নিয়েই আজ তথাগতর সঙ্গে গাড়িতে বচসা চলছিল। হয়তো মেন্টালি খুব ডিসটার্বড হয়ে পড়েছিল তথাগত। এবং মনঃসংযোগের অভাব থেকেই দুর্ঘটনা। ভাস্বতী যে শুধু নিজের সুখের জন্য তাকে ব্যবহার করছে, এই বোধটুকু আগে এলে তথাগতকে হয়তো মরতে হত না।

রবিন অস্ফুটে বলল—কী কাণ্ড, তুই ভাস্বতীকে একেবারে ডাইনি বানিয়ে দিলি?

—আমি কিছুই বানাইনি। আমি মেয়েদের ভালভাবেই চিনি। মেয়েরা বেসিক্যালি শুধু নিজেরটুকুই বোঝে।

—তোর দেখছি মেয়েদের ব্যাপারে হেভি ফান্ডা? কটা মেয়ে দেখেছিস জীবনে?

—বেশি দেখার দরকার হয় না। যার চোখ আছে, তার বিন্দুতেই সিন্ধুদর্শন হয়। সৌরভ ক্রমশ উত্তেজিত। জ্বলন্ত সিগারেটখানা ছুঁড়ে মারল বাইরের অন্ধকারে। সোজা হয়ে বসে বিড়বিড় করে বলল, মেয়ে জাতটাই অসম্ভব ডিমান্ডিং। কোনওভাবে কোনও দিক দিয়েই তাদের খুশি করা যায় না।

রবিন আড়চোখে আমায় দেখল। আমি রবিনকে। কোন ক্ষোভে সৌরভ পুড়ছে, তার কিছুটা জানি বইকি। আমাদের মধ্যে সৌরভই খুব একটা প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। অবশ্য আমরাও যে খুব রাজাউজির বনেছি তা নয়। তবু মোটের ওপর চাকরিটা ভালই করি, সচ্ছলতার একটু ওপরের ধাপেই আছি আমি আর রবিন। সৌরভ সরকারি অফিসের কেরানি। কিন্তু তার গিন্নিটি মেজাজে মহারানি। অনিতার এই চাই, ওই চাই-এর ঠেলায় চোখে সর্ষেফুল দেখে সৌরভ। উপরি রোজগারের নানান ফন্দিফিকির খুঁজতে হয় বেচারাকে। বাঁ হাতে উপার্জনের জন্য সৌরভ খানিকটা মরমে মরে থাকে, আমি জানি। কিন্তু অনিতার ওপর রাগটা ভাস্বতীর ওপর আছড়ে পড়বে কেন? ভাস্বতীকেই বা এক লোভী, আত্মসুখপরায়ণ বলে চিহ্নিত করা কতটা যুক্তিযুক্ত?

গাড়ি একটা শহর অতিক্রম করছে। সম্ভবত রানাঘাট। কেমন যেন ঘুমন্ত পুরী, ঘুমন্ত পুরী লাগছে জায়গাটাকে। এত রাতে মানুষও দেখা যায় এক-আধটা। লরিটরির খালাসি ড্রাইভার গোছের লোকজন। একটা ছোট্ট হোটেলও খোলা আছে। হোটেল নয়, দোকান। ধাবা গোছের।

রবিন জিজ্ঞেস করল, দাঁড় করাব গাড়ি? চা খাবি?

—পেলে মন্দ হয় না।

ভাবা মাত্র কাজ। তুরন্ত গাড়ি সাইড করে নামল রবিন। আমিও। সিগারেট ধরাচ্ছি, রবিন ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে এল। বলল, তড়কা রুটিও হবে। খাবি নাকি?

সৌরভও নেমেছে। ঘড়ি দেখতে দেখতে বলল, একটা চল্লিশ। পৌঁছতে পৌঁছতে ডেফিনিটলি আরও ঘণ্টা খানেক।

—তা তো লাগবেই। কৃষ্ণনগরে ঢুকে হাসপাতাল খুঁজে বার করা... ওসব জায়গার কিছুই চিনি না। কতক্ষণ লাগে, না লাগে... পেটটা একটু লোড করে রাখি চল।

—হুম। অত রাতে পৌঁছে ওখানেও তো কিছু জোটার চান্স কম।

—তবু পৌঁছে গেলে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত।

—পৌঁছে কি আর নিশ্চিন্ত থাকতে পারবি? তখন হয়তো চা'ও গলা দিয়ে নামবে না।

আলোচনা চালাতে চালাতে বসেই পড়েছি তিনজনে। দোকানের বাইরে পাতা বেঞ্চিতে। রবিনের ড্রাইভার সুরিন্দর শুধু চা নিল এক গ্লাস। আমাদের সামনে গরম করা তড়কার প্লেট, হাতে গড়া রুটি। ছোকরা দোকানদার পেঁয়াজ লংকাও দিয়ে গেছে। স্যালাড।

তড়কা জিভে ঠেকিয়ে রবিন বলল, প্রচুর ঝাল দিয়েছে তো!

—খানা কিছু পড়ছে পেটে, এই না ঢের। সৌরভ স্বমে ফিরেছে। তড়কা মাখিয়ে রুটি মুখে পুরে বলল, টেস্টটা মন্দ নয়।

—খিদের মুখে সবই অমৃত। পেঁয়াজে কামড় বসালাম। খেতে খেতে বললাম, রুটিটাও বেশ নরম।

—তড়কায় বোধহয় চানার ডাল মিশিয়েছে।

—মনে হচ্ছে। কিমা দেওয়া থাকলে আরও জমে যেত। সেবার দিল্লি থেকে জয়পুর যাওয়ার পথে যা বিউটিফুল তড়কা খেয়েছিলাম না...। কথাটা বলে ফেলেই কেমন যেন হোঁচট খেলাম। আমাদের এক প্রিয় বন্ধুর মৃতদেহ পড়ে আছে হাসপাতালে, এতক্ষণ তাকে নিয়ে আমরা কত উতলা ছিলাম, অথচ এই মুহূর্তে তুচ্ছ তড়কা নিয়ে গল্পে মাতছি! শোক এতই ক্ষণস্থায়ী! রুটির টুকরোটুকু কোনওক্রমে গিলে জল খেলাম এক ঢোক। নিচু গলায় বললাম, একটা খুব ভুল হয়ে গেছে রে।

রবিন চোখ তুলল —কী?

—জয়িতাকে বোধহয় খবর দেওয়া উচিত ছিল।

সৌরভ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—জয়িতা জেনে কী করবে?

—ভুলে যাচ্ছিস কেন, তথাগতর একটা ছেলেও আছে। বাপ ছেলের সম্পর্কটা তো মুছে যায়নি। এখন নয় তোতোন ছোট, বড় হয়ে সেও তো বলতে পারে বাবাকে শেষবারের মতো একবার দেখানোটা তোমাদের কর্তব্য ছিল।

—হুম। রবিন মাথা দোলাল, কিন্তু এখন তো কিছু করার নেই, সকালটা হোক।

—জয়িতার বাপের বাড়ির নম্বর জানিস?

—আমার পুরনো ডায়েরিতে থাকতে পারে। আমি তো কোনও ডায়েরি ফেলি না।... সকালে সীমাকে ফোন করে জেনে নেওয়া যাবে। রবিনকে ঈষৎ বিমনা দেখাল। ভারী গলায় বলল, ছেলেকে বাপের মৃত্যুসংবাদ দেওয়া... কী অপ্রিয় কাজ যে করতে হবে! তথাগতটা মাইরি সত্যি-সত্যি ফাঁসিয়ে দিয়ে গেল।

সৌরভ গোমড়া স্বরে বলল, কিংবা ভাস্বতী। ইউ ক্যান নেভার বি শিওর, কে আমাদের অ্যাকচুয়ালি ফাঁসাল।

রবিন অপ্রসন্ন মুখে বলল —ফের ওই কথা! চুপ কর তো।

—কেন! আমি কি ইল-লজিক্যাল কিছু বলেছি?

সৌরভের চোয়াল শক্ত। তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম—কী তোরা তখন থেকে এর দোষ ওর দোষ করে এঁড়ে তর্ক জুড়েছিস। দোষ হয়তো কারওই নয়। ওরা জাস্ট পরিস্থিতির শিকার।

রবিন কাঁধ ঝাঁকাল—হতেও পারে। গাড়ি হয়তো ঠিকঠাকই চলছিল, লরি ওদের বেমক্কা ঝেড়ে দিয়েছে। লাইক গড। অর ডেভিল।

—হুম্। তবে আমি শুধু অ্যাক্সিডেন্টটার কথাই বলছি না। তথাগত আর ভাস্বতীর গোটা জীবনটাই তো...। বলতে বলতে দূরমনস্ক হয়েছি সহসা। স্মৃতি হাতড়াচ্ছি। নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার বয়স এখনও হয়নি, কাজেকর্মে ডুবে থাকি, তাই হয়তো নিকট অতীতও এখন আবছা আবছা ছবি। সেই ফোটো অ্যালবাম উল্টোচ্ছি মনে মনে। শান্তভাবে বললাম, তোদের মেমারি কতটা শার্প আমি জানি না। আমার কথা বলতে পারি, কলেজ লাইফের ডে টু ডে ডিটেল আমার স্মরণে নেই। তাই ভাস্বতী আগে তথাগতর প্রেমে পড়েছিল, না তথাগত ভাস্বতীর, তা আমার পক্ষে বলা বেশ কঠিন। কিন্তু হ্যাঁ, তথাগত ছেলে হিসেবে অবশ্যই জুয়েল ছিল। ভাস্বতীও মোটেই ফ্যালনা ছিল না। আমরাই তো বলতাম, মেড ফর ইচ আদার। জে-এন-ইউতে এম-এ পড়ার ইচ্ছে তথাগতর ছিলই। সুতরাং ভাস্বতী তাকে ল্যাং মেরেছিল বলেই সে চলে গিয়েছিল, অথবা ভাস্বতীকে ডিচ করার উদ্দেশ্যেই তার দিল্লি পলায়ন—কোনওটাই আমি জোর গলায় বলতে পারব না। দু-আড়াই বছর ধরে ভাস্বতী তথাগতর প্রতীক্ষায় কেন বসে থাকেনি, কেন আশিসবাবুর প্রেমে পড়ল, তাও বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। হতে পারে, ওদের মাঝে দূরত্ব তৈরি হচ্ছিল। হতে পারে, পুনমের নিউজটা ভাস্বতীকে দূরে ঠেলেছিল। এরকম অবস্থায় আশিসবাবুর মতো মিষ্টভাষী দায়িত্ববান মানুষের দিকে ঝুঁকে পড়া এমন কিছু অস্বাভাবিকও নয়। ...যাই হোক, তথাগত ভাস্বতী দুজনেই কিন্তু পরে বিয়ে করে যে যার মতো সুখী হতে চেয়েছিল। তথাগতর দুর্ভাগ্য, জয়িতা ওয়াজ টোটালি মিসম্যাচ ফর হিম। আমরা তো দেখেইছি, ওরা দুজনে দু মেরুর মানুষ। জয়িতা কঠোর নিয়মতান্ত্রিক, শৃঙ্খলাপরায়ণ। মানে আমাদের রবিনের টাইপ। আর তথাগত তো তথাগতই। বরকে নিজের ছাঁচে ঢালাই করতে গিয়ে ভুল করে ফেলেছিল জয়িতা। তাতেই উল্টো বিপত্তি, আরও উদ্দাম হয়ে গেল তথাগত। কে জানে হয়তো নিজেকে ভেঙেচুরে জয়িতার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। তবে জয়িতা ওকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর, ওর লাইফটা কিন্তু পুরো ভ্যাকুয়াম হয়ে গেল। তোতোনকেও পেল না, পৃথিবীতে ও সম্পূর্ণ একা...ভয়ংকর নিঃসঙ্গতা ওকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত। আপাতচোখে ওকে যেমনই লাগুক, ভেতরে ভেতরে ও বড় বেশি ইমোশনাল ছিল যে। আমাকে একবার বলেও ফেলেছিল, এখন আমার বেঁচে থাকা আর না থাকার মধ্যে কোনও তফাত নেই রে জয়! আমার অস্তিত্বটাই যেন কেমন অর্থহীন!

রবিন চোখ সরু করল—এসব বলত নাকি?

—অবাক হওয়ার কী আছে! সৌরভ বলে উঠল, আমরা তো জানি ও খুব দুঃখী ছিল। ওর ওই যন্ত্রণাটাকেই তো ভাস্বতী এনক্যাশ করেছে।

—আবার সেই একবগ্গা চিন্তা! সৌরভের পিঠে হাত রাখলাম, ভাস্বতীকে বা খারাপ বলে ধরে নিচ্ছিস কেন? ভাস্বতীরও অনেক কষ্ট ছিল। পরপর মিসক্যারেজ... আশিসবাবুর সঙ্গে সম্পর্কটাও স্টেল হয়ে আসছে... এমন একটা সময়ে তথাগতর সঙ্গে তার আবার দেখা। তথাগত তখন একটা ভগ্নস্তূপ। মনের দিক দিয়ে ভাস্বতীরও প্রায় সেই দশা। ওরা পরস্পরের কাছে মানসিক আশ্রয় তো চাইতেই পারে।

রবিনের খাওয়া শেষ। ছোট একটা ঢেকুর তুলে বলল —চাক না আশ্রয়, কে বাধা দিচ্ছে! কিন্তু লুকিয়ে চুরিয়ে কেন বাপ? তথাগত কেন বিয়ে করে নিল না ভাস্বতীকে? কেন তাকে ফোর্স করল না ডিভোর্স নেওয়ার জন্যে?

—নিশ্চয়ই কোনও অসুবিধে ছিল। মেন্টাল অবস্ট্রাকশানটা ওরা হয়তো ওভারকাম করতে পারেনি।

—আর তাই পরকীয়া? এবং সেটাকে তুই সাপোর্টও করছিস!

—নিন্দেও করছি না। কোনও শূন্যতাবোধ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ওরা যদি পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে...

—বা রে বা! শূন্যস্থান পূরণের তাহলে এটাই একমাত্র দাওয়াই? সোসাইটি, ভ্যালুজ, সামাজিক নিয়মকানুন, এসব আর তাহলে রাখার দরকার কী!

—ভুল করছিস রবিন। সমাজের নিয়ম সমাজের গরজেই থাকবে। আবার তথাগত ভাস্বতীরাও বাঁচতে চাইবে নিজেদের মতো করে। এটাই বাস্তব।

—অল বকোয়াস্। সৌরভ গ্লাসের জলে হাত ধুচ্ছে। ভিজে আঙুল ঠোঁটে বুলিয়ে বলল, পরকীয়া ইজ নাথিং বাট সেক্স। এবং আশিসবাবু ভাস্বতীর সম্পর্কের গ্যাপটাও বেস্‌ড অন সেক্স।

—অত সরলীকৃত করে দিস না সৌরভ। মানুষের চাহিদা যদি শুধুই যৌনতা হয়, তাহলে তো কুকুর বেড়ালের সঙ্গে তার কোনও তফাত থাকে না। খিদে জাগল, কী অতৃপ্তি এল, অমনি মানুষ যাকে পেল তার সঙ্গে ইয়ে শুরু করল, এমনটা কি হয়? মানুষের বেলায় মনেরও একটা

বড় ভূমিকা থাকে। আগে হৃদয়, তার পরে শরীর। যার কাছে ফিজিকাল আর্জই সব, সে তো জন্তুর শামিল। আশা করি, তথাগত আর ভাস্বতীকে তুই ওই ক্যাটেগরিতে ফেলছিস না! তেমনটা হলে ওদের সম্পর্ক ছ-সাত বছর ধরে টিকে থাকত কী?

সৌরভের বুঝি খুব একটা মনঃপূত হল না কথাগুলো। তবে প্রতিবাদও করল না আর। চা দিয়ে গেছে দোকানদার, চুমুক দিচ্ছে গ্লাসে।

বিল টিল মিটিয়ে গাড়িতে ফিরতে প্রায় আড়াইটে। হিম পড়ছে বেশ, শীত শীত করছিল। কাচ তুলে দিয়ে সিটে হেলান দিলাম তিনজনেই। ভরা পেটে ঘুম ঘুম পাচ্ছে, জড়িয়ে এল চোখ।

রবিনের ডাকে তন্দ্রা ছিঁড়ল —এই জয় ওঠ, এসে গেছি।

চোখ রগড়ে দেখলাম একেবারে হাসপাতাল-কম্পাউন্ডে এসে দাঁড়িয়েছে গাড়ি। সঙ্গে সঙ্গে বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। তথাগত ভাস্বতীর কাছে পৌঁছে গেলাম তাহলে! গোটা পথ দু'জনকে নিয়ে কাটাছেঁড়া হয়েছে অনেক, এবার তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়নোর পালা!

নামলাম গাড়ি থেকে। পা টলছে। হাঁটুর জোর কমে গেল কেন হঠাৎ? অনেকক্ষণ টানা বসে আছি বলে? কাঁপছিও যেন অল্প অল্প। শেষরাতের বাতাস কি এত শীতল? না কি দূর থেকে মৃত্যু নিয়ে ভাবা আর মৃত্যুর একদম কাছে এসে পড়ার মধ্যে অনেকটাই পার্থক্য, সেটাই জানান দিচ্ছে মস্তিষ্ক।

দোতলা হাসপাতাল। চত্বর পুরোপুরি নিঃসাড় নয়। টুকরো টাকরা আওয়াজ উড়ে আসছে। ধাতব ধ্বনি। মানুষের স্বর। বুঝি বা বাতাসের শব্দও। হাসপাতাল প্রাঙ্গণে এক ঝাঁকড়া আমগাছ, নীচের বাঁধানো বেদিতে ঘুমোচ্ছে জনা কয়েক লোক। একমাত্র এক বৃদ্ধই শুধু জেগে। হাঁটুতে মুখ গুজে বসে আছে উদাসীন। এই পৃথিবীতে নিদ্রার মেয়াদ বুঝি পূর্ণ হয়ে গেছে বৃদ্ধর।

সৌরভ এগিয়ে এনকোয়্যারির দিকে গেল। আমি আর রবিন হাঁটছি শ্লথ পায়ে। কোথাও একটা বাচ্চা কেঁদে উঠল। নবজাতক কী? সবে এল দুনিয়ায়? লম্বা টানা করিডোর পেরিয়ে হনহন চলেছে এক সেবিকা। তার পোশাকের শুভ্রতা চোখে লাগছিল বড়।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ফিরেছে সৌরভ। ফ্যাসফেসে গলায় বলল —দুটো লাশই চালান করে দিয়েছে মর্গে। ডাক্তার আসবে বেলা দশটায়, তার পর পোস্টমর্টেম।

রবিন শুকনো গলায় বলল —ও। তাহলে এখন কী কর্তব্য?

—অপেক্ষা।

—আর কেউ পৌঁছেছে কিনা খবর নিলি?

—আমরাই প্রথম। ...ওরা বলছিল চাইলে এখন গিয়ে একবার দেখে আসতে পারি।

শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। একবার রবিনকে দেখছি, একবার সৌরভকে। সিগারেট বার করে চাপলাম ঠোঁটে। দেশলাই হাতড়াচ্ছি। এ পকেট, ও পকেট। অন্ধের মতো।

রবিন দুর্বল স্বরে বলল —কী রে, যাবি এখন?

তিনটে কাঠি মিস করে চতুর্থ কাঠিটা জ্বালিয়েছি। খানিকটা ধোঁয়া গিলে বললাম — যেতে তো হবেই। সে এখনই হোক, কী পরে।

সৌরভ বলল —হ্যাঁ, শনাক্ত করার জন্যও তো... ধর আদৌ যদি ওরা না হয়! হয়তো অন্য কোনও তথাগত! অন্য এক ভাস্বতী!

জানি এ একান্তই অসম্ভব। তবু এই মুহূর্তে কথাটা বিশ্বাস করতে খুব ইচ্ছে করছিল। ফুসফুসে তামাকপোড়া বাতাস ভরে নিয়ে বললাম —না হলেও তো একবার দেখতেই হবে। চল্, এখনই নয় ঘুরে আসি।

বারবার যাওয়ার কথা বলছি বটে, কিন্তু কারওই যেন পা সরছে না। যে তথাগত আর ভাস্বতীকে নিয়ে আমরা অত চর্চা করছিলাম, না দেখার জোরে তাদের বুঝি আমরা জ্যান্ত রাখতে চাইছি। যেন সামনে গিয়ে পড়লে ওরা সত্যি সত্যি মরে যাবে।

খোলা মাঠ থেকে লাশঘর কী আর এমন দূর, তবু ওটুকু পেরোতে যেন কত বছর লেগে গেল। হিমেল ঘরটায় চাপা বোটকা গন্ধ। বাতি জ্বলছে টিমটিম। হলদেটে। আবছায়া মাখা মলিন টেবিলে পাশাপাশি শুয়ে দুটো দেহ। নিথর। গলা অবধি সাদা চাদরে ঢাকা।

হ্যাঁ, ওরাই। তথাগত আর ভাস্বতী।

রবিন বিড়বিড় করে বলল —আশ্চর্য, মাথায় মুখে কোনও চোট নেই!

সৌরভ অনুচ্চ স্বরে বলল —বোধহয় মিডল্ রিজিয়নে ধাক্কা খেয়েছে। বুকে... পেটে...। তথাগতর মুখখানা দ্যাখ্... যেন সমস্ত সমস্যার অবসান, আরামসে ঘুমোচ্ছে।

রবিন আত্মগতভাবেই বলল —ভাস্বতীর মুখটা কেমন জ্বলজ্বল করছে। উদ্বেগ, অতৃপ্তি, অশান্তি, কিচ্ছুটি নেই। বরং তথাগতকেই যেন...!

আমি অবশ্য দুটো মুখেই প্রশান্তি দেখতে পাচ্ছিলাম। দু'জনেই যেন স্বস্তি পেয়েছে, বহুকাল পর।

নাহ্, আমরা কেউই সত্যিকারের তথাগত বা ভাস্বতীকে দেখছি না এখনও। চোখে যা পড়ছে, তা তো আমাদেরই মনের প্রতিচ্ছায়া। আমাদেরই ভাবনার আদলে গড়া দুটো মানুষ।

ধীর পায়ে বেরিয়ে এলাম হিমঘর থেকে। বাইরে ভোরের আলো ফুটছে। ভাঙা চাঁদ উবে গেছে আকাশ থেকে। পাখিরা জাগছিল।

অঙ্কন : অনুপ রায়

This Book Downloaded From
http://Doridro.com